বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৪১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪৩০

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র কৃষকদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু?

এম এ সাত্তার মন্ডল*

১। ভূমিকা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে দুটো প্রায় যুগপৎ ঘটনা কৃষি সম্পর্কে আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। একটি হচ্ছে কোভিড-১৯ অতিমারি সময়ে উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়ায় জনমনে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। অপরটি হচ্ছে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর পূর্তি, যা আবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সাথে মিলে গেছে, সেখানে কৃষক শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন বিষয়ক বহুবিধ আলোচনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। একদিকে যেমন আমরা আমাদের জাতীয় গৌরবময় অধ্যায় সানন্দ সাড়ম্বরে উদযাপন করেছি, তেমনি করোনাকালীন দুর্ভোগ দুর্গতিতে আমরা দারুণ ভোগান্তির শিকার হয়েছি। বিশেষ করে, উৎপাদন, যোগাযোগ ও বিপণন-ব্যবস্থায় যে চরম বিপত্তি দেখা দেয়, তাতে অর্থনীতির চাকা ক্ষতিগ্রস্ত এবং কৃষি, শিল্প ও কলকারখানায় উৎপাদন বিঘ্নিত হয়।

কোভিড কাল ও কোভিড পরবর্তী সময়ে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে আপৎকালীন সরকারি তৎপরতা লক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রাকার খণ্ডায়িত খামার ও ছোট ছোট কৃষকগণ সবুজ বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় কৃষি উন্নয়নে যে অভূতপূর্ব গতিময়তা সৃষ্টি করতে পেরেছিলো, তা ধরে রাখা সম্ভব হবে কিনা এ নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এসব জিজ্ঞাসা প্রধানত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকরণ সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থা চালু রাখার ওপরই সীমাবদ্ধ রয়েছে। অথচ দৈব দুর্বিপাকের মাঝেও এদেশের কৃষক, যাদের প্রায় পুরোটাই ক্ষুদ্র চাষি, তারা তাদের সীমিত পুঁজি ও প্রযুক্তি জ্ঞান দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কীভাবে অব্যাহত রেখেছে তা নিয়ে তেমন আলাপ আলোচনা হয়নি। এছাড়াও ক্ষুদ্রাকার কৃষি খামার, জমির মালিকানা ও ভোগদখল ব্যবস্থা এবং জমির ক্রমাগত খণ্ডায়ন সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি যন্ত্রায়ন ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য কৃষক ও কৃষি সেবা প্রদানকারীগণ যেসব উদ্ভাবনমূলক ব্যবস্থাপনাগত কৌশলের বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছে, তা নিয়ে আরও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যেই বর্তমান লেখাটির সূত্রপাত। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর অর্থানুকূল্যে পরিচালিত 'কৃষি জাগতিক পরিবর্তনের রাজনৈতিক অর্থনীতি' সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ের গবেষণার প্রারম্ভিক ফলাফলের আলোকে এ প্রবন্ধে পরিবর্তনশীল কৃষি ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার কিছু প্রতিফলন তুলে ধরা হলো।

---

*ইমেরিটাস প্রফেসর, বাকৃবি ও প্রফেসরিয়াল ফেলো, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। এ গবেষণার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কাজে আমার সাথে সার্বক্ষণিক যুক্ত আমার গবেষণা সহযোগী শাহ আলম সিদ্দিকী ও ড. মো: ইউসুফ আলীর কাজের প্রতি অঙ্গীকার ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই যুক্তরাজ্যের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর জেফ উডের প্রতি, যার সাথে গবেষণার শুরু থেকেই বহু আলোচনা ও মত বিনিময় হয়েছে। এছাড়াও বিআইডিএস এবিসিডি কনফারেন্স ২০২৩ (ABCD Conference 2023) এ গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মন্তব্য পেয়ে বেশ উপকৃত হয়েছি।

২। কৃষির অর্জন

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে মোটা দাগে কৃষির অর্জনগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক। গত প্রায় এক দশক ধরে গড়ে ৩ শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে, যদিও মোট জিডিপিতে কৃষির আনুপাতিক হিস্যা ১৯৮০ দশকের ৩৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২১-২২ সালে ১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটা গাণিতিক হিসাব। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে শিল্প সেবাসহ অন্যান্য উপখাতসমূহের হিস্যা বেড়ে যাওয়া সাধারণ নিয়ম। শতকরা হিসেবে কৃষির আনুপাতিক অংশ কমে গেলেও কৃষির সামগ্রিক জিডিপির পরিমাণ অবশ্যই বেড়ে যায়। বাংলাদেশেও তাই হয়েছে। কৃষি জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষির আন্তঃখাতগুলোর মধ্যেও হিস্যার বিভাজনে পরিবর্তন এসেছে। যেমন কৃষি জিডিপিতে ফসল উপখাতের হিস্যা ১৯৯০ সালে যেখানে ৬৫ শতাংশ ছিল, ২০২১-২২ সালে তা ৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে এবং একই সময়ে প্রাণিসম্পদ উপখাতের হিস্যা ১২ থেকে ১৫ শতাংশ এবং মৎস্য উপখাতের হিস্যা ১৫ থেকে ২২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে (বিইআর, ২০২৩)।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কৃষিতে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, ১৯৭২-৭৩ সালে আমাদের মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ২৮ ডেসিমাল, আর আজকে পঞ্চাশ বছর পরে এসে তা দাঁড়িয়েছে ১০ ডেসিমালে। অথচ তখন খাদ্যশস্য, যার মধ্যে চাল ও আটা ছিল, বছরে মাথাপিছু ১৪০ কেজি উৎপাদিত হতো। আর সেটা এখন ২০২২-২৩ সালে বেড়ে ২৮৫ কেজি হয়েছে। চাল ও গমের সাথে এখন অন্যতম প্রধান ফসল হিসেবে ভুট্টাও যোগ হয়েছে। এর অর্থ, আবাদি জমির পরিমাণ বছরে প্রায় অর্ধ-শতাংশ হারে হ্রাস পেলেও পঞ্চাশ বছরে আমরা মাথাপিছু প্রায় ১৪৫ কেজি বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পেরেছি। গরু, খাসি ও মুরগির মাংসের কথা ধরা যাক। তখন আমরা বছরে মাথাপিছু মাত্র ৩.৫ কেজি মাংস উৎপাদন করতাম, ২০২১-২২ সালে সেটা ৫৫ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে দুধের উৎপাদন ছিল বছরে মাথাপিছু মাত্র ৬.৩ কেজি, সেটা এখন ৭৭ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে ডিমের উৎপাদন ছিল বছরে মাথাপিছু ১৫টি। সেই বাংলাদেশে আমরা এখন বছরে মাথাপিছু ১৩৮টি ডিম উৎপাদন করছি। কৃত্রিম উপায়ে মাছ চাষেও বিপ্লব ঘটে গেছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে মাথাপিছু মাত্র ১১ কেজি মাছ উৎপন্ন হতো, আর ২০২১-২২ সালে মাথাপিছু ২৮ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়। এটা ফ্যাক্টস, ফিকশন নয়। তাই আমরা এটাকে অনায়াসে 'অষ্টম আশ্চর্য' বলে আখ্যায়িত করতেই পারি (এসব তথ্যের সূত্র হচ্ছে বিবিএস, ১৯৭৯; খলিল, ১৯৯১; হামিদ, ১৯৯৩; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২৩; এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০২০)।

কৃষির এই বিস্ময়কর অগ্রগতির আশু ফল পেয়েছে জাতি। আমাদের প্রধান খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা এসেছে, যদিও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কখনও কখনও কম-বেশি খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন পড়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে শাকসবজি মাছ মাংস ডিম দুধের মতো পুষ্টিকর খাবারের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে ভোজ্য তেল ও মশলা জাতীয় খাবারের ঘাটতি রয়ে গেছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ আয় বাড়ছে, দারিদ্র্য ও অনাহার অপুষ্টি হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ কেবল 'দুর্ভিক্ষের ছায়া' থেকেই বের হয়ে আসেনি, সেই সঙ্গে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তাও বহুলাংশে নিশ্চিত করতে পেরেছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, আমাদের মাথাপিছু আয় এখন ২,৭৬৫ ডলারে উন্নীত হয়েছে। এর সঙ্গে কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কৃষি জমি ও শ্রমশক্তির উৎপাদিতা বৃদ্ধির শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে।

৩। কৃষি জাগতিক প্রশ্নমালা

উপরে উল্লিখিত কৃষির দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা থেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে কৃষির অগ্রগতির খেলোয়াড় কারা? অর্থাৎ যে জমি থেকে ফসলাদি উৎপন্ন হচ্ছে সেসব জমি আসলে চাষ করে কারা? তাদের হাতে কতটুকু জমির মালিকানা বা তারা কী ধরনের বর্গা ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যের জমি আবাদ করে? অথবা যারা জমি নিজেরা চাষ না করতে পেরে অন্যের কাছে জমি বর্গা বা বন্ধকি দিয়ে দিচ্ছে তা কী কারণে দিচ্ছে বা তার শর্তাদিই বা কী? আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, কৃষিতে যে আধুনিক প্রযুক্তি এসেছে এবং সামনে আসছে তাতে ক্ষুদ্র চাষিরা লাভজনকভাবে আগামী দিনের কৃষিতে টিকে থাকতে পারবে কিনা? বিশেষ করে, গ্রাম থেকে তরুণ শ্রমশক্তির দেশ ও বিদেশে অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের যে প্রকট অভাব দেখা দিচ্ছে, তাতে করে আগামী দিনে কৃষি পুরোটা যন্ত্র-নির্ভর হয়ে পড়লে ছোট ছোট খামারিরা কি টিকে থাকতে সমর্থ হবে? নাকি এমন অবস্থায় শিল্প-কর্পোরেটরা বাণিজ্যিক কৃষিতে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে এবং বাস্তবে তার সম্ভাবনাই বা কতটুকু? পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এসব প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। এ কথা স্বীকার্য যে, এসব প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসার জন্য যে বৃহৎ আকারের ব্যয়বহুল বিস্তারিত গবেষণার দরকার আমরা তা করতে পারিনি। এখানে কেবল গ্রাম পর্যায়ে জমির মালিক, কৃষক গ্রুপ, কৃষি সেবা প্রদানকারী উদ্যোক্তা ও সরকারি বেসরকারি কৃষি কর্মীদের সাথে মুখোমুখি বৈঠকের মাধ্যমে লব্ধ তথ্যগুলোর ওপর প্রতিফলন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪। পরিসংখ্যান কী বলে?

বিবিএস এর কৃষি শুমারি ২০১৯ প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার। তবে এখানে খামারের আকার অনুযায়ী কোনো শ্রেণিবিন্যাস দেখা যায়নি। এ সংখ্যা ২০০৮ এর কৃষি শুমারি তথ্যের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেশি। তবে বিবিএস ২০১৮ সালের কৃষি ও গ্রামীণ পরিসংখ্যানে কৃষি খামার পরিবারের মোট সংখ্যা কিছুটা বেশি দেখা যায়, যার পরিমাণ ১ কোটি ৭৩ লাখ ৪০ হাজার। এতে আরও দেখানো হয়েছে যে, ক্ষুদ্র খামারের সংখ্যা আগের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেড়েছে এবং একই সময়ে মধ্যম আকারের খামারের সংখ্যা ২৯ শতাংশ এবং বড় খামারের সংখ্যা ৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।[১] খামারের গড় আয়তন ০.৮ একর। বিবিএস ২০১৮ অনুযায়ী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, যাদের নিজেদের মালিকানাধীন ও অন্যের কাছ থেকে বর্গা/বন্ধক নেওয়া জমি মিলিয়ে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ২.৫ একরের নিচে তাদের সংখ্যা হচ্ছে মোট কৃষকের ৯২ শতাংশ এবং তাদের চাষাধীন জমির পরিমাণ মোট আবাদযোগ্য জমির ৬০ শতাংশ। বাকি জমি মধ্যম ও বড় কৃষকদের হাতে এবং তাদের সংখ্যা মোট কৃষকের ১০ শতাংশেরও নিচে। কাজেই সংখ্যা এবং জমির পরিমাণ উভয় বিচারেই

[১] প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষুদ্র খামারের আয়তন অনূর্ধ্ব ২.৫ একর, মধ্যম খামারের আয়তন ২.৫-৭.৫ একর এবং বড় খামারের আয়তন ৭.৫ ও তদূর্ধ্ব একর।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের প্রাধান্য দিন দিন বেড়েই চলছে। বিদ্যমান মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জমির প্রতি মানুষের যে প্রগাঢ় টান, তাতে এ ধরনের পরিবর্তন একেবারেই অভিপ্রেত।

এর আগে মাহবুব হোসেন ও বায়েস (২০১৫) এর গবেষণায়ও দেখা গেছে যে, মধ্যম ও বড় কৃষকরা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে এবং ছোট কৃষকদের সংখ্যা ও তাদের চাষাধীন জমির পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের চলমান গবেষণায় স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে যে বড় ও মধ্যম কৃষক পরিবারগুলোতে কৃষিকাজ করার মতো নিজস্ব লোকবল নেই এবং তারা প্রধানত কেনা শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল বলে খামার কাজ পরিচালনা করা ব্যয়বহুল এবং প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই তারা অন্যের কাছে জমি বর্গা, বন্ধক, লিজ দিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে ছোট কৃষকদের রয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি পারিবারিক শ্রমিক, যার মধ্যে বয়স্ক পুরুষ, মহিলা এবং স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরাও আছে। আমাদের মতে, এই পরিবার কেন্দ্রিক শ্রমিকের প্রাপ্যতাই হচ্ছে কৃষিকাজে লিপ্ত থাকা না থাকার প্রধান নিয়ামক। এরপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে জমি চাষের জন্য পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ও যান্ত্রিক সেচ ব্যবস্থার প্রাপ্যতা।[২] তবে, আমরা এটাও লক্ষ করেছি যে, বড় ছোট নির্বিশেষে সকল কৃষক পরিবারের তরুণ সদস্যদের মাঝে কায়িক শ্রমসাধ্য কৃষিকাজের প্রতি অনাগ্রহ বাড়ছে। বাধ্য না হলে তারা কৃষিকাজের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়। এর কয়েকটি গভীর তাৎপর্য ধরা পড়েছে। প্রথমত, কৃষিকাজকে অন্যান্য পেশার তুলনায় তেমন কোনো লাভজনক বা সামাজিকভাবে সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হয় না বিধায় সংগত কারণেই তরুণদের এ কাজে অনীহা বাড়ছে,[৩] বিশেষ করে যখন কৃষি পণ্যের বাজার দাম নিম্ন পর্যায়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, সম্ভাব্য কৃষি শ্রমিকরা শহরাঞ্চল ও দেশান্তরী হওয়ার ফলে কৃষি শ্রমিক বাজারে সময়মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্যতার সংকট তৈরি হচ্ছে। তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র চাষি পরিবারগুলোকেও কৃষির ব্যস্ত মৌসুমে কিছুটা হলেও ভাড়াকৃত শ্রমিকের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে; এতে তাদের নগদ খরচ বেড়ে যায় এবং লাভের পরিমাণ কমে যায়। এই সংকটের আরেকটি দিক হচ্ছে বর্তমানে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সদস্যরাই কৃষিকাজে বেশি নিয়োজিত রয়েছে। তাদের গড় আয়ুষ্কাল ৪৫-৫০ বছর বিবেচনায় নিলে এসব ছোট কৃষকদের সীমিত প্রযুক্তি জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা পরিণামে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক (ইকনোমিজ অব স্কেল) পর্যায়ে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়বে এবং এ কারণে খামার পরিচালনা করার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবার আশঙ্কা রয়েছে।

৫। নব্য কৃষকদের নব্য ব্যবস্থাপনা

তাহলে হাত লাগিয়ে গায়ে গতরে খেটে কৃষিকাজ কারা করছেন? আমাদের গবেষণা বলছে, তারা হচ্ছে নব্য কৃষক এবং তাদের প্রধান শক্তি নিজের পারিবারিক শ্রম। একসময় যারা জমিসম্পন্ন বড় ও ছোট কৃষকদের ক্ষেতে মজুরি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো, প্রধানত তারাই এখন চাষি। এদের অনেকেই

[২] বিনায়ক সেন ও অন্যান্যদের সাম্প্রতিক গবেষণায় এ বিষয়ে বিভিন্ন জরিপের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে (সেন, ২০১৮; সেন ও অন্যান্য, ২০২৩)।

[৩] জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদেরকে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও তাদের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষিকে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছে।

একেবারে ভূমিহীন অথবা বাস্তুভিটাসমেত সামান্য জমির মালিক। আগে এরা বেশি জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি বর্গা নিত ফসলের আধাআধি ভাগ দেয়ার বিনিময়ে। এখন ভাগচাষ বর্গা প্রথা প্রায় উঠে যাচ্ছে, থাকলেও বর্গাচাষি ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ এবং জমির মালিক এক-তৃতীয়াংশ পায়। তারা নিজের জমিটুকুর সাথে অন্যের কিছু জমি নগদ টাকার বিনিময়ে বর্গা বা বন্ধক চুক্তিতে বা বছর চুক্তি বা দীর্ঘমেয়াদি লিজ নিয়ে পরিবারের ছেলেপুলে ও মহিলা নিয়ে উদয়াস্ত কায়িক শ্রম দিয়ে নিবিড়ভাবে চাষাবাদ করছে। এদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বছরে অন্তত দুটো ধান করে নিজের ঘরে খাবারটা নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণ ও আধুনিক সেচ সুবিধা সহজলভ্য হওয়ায় কার্যত: রবি মৌসুম আগের চেয়ে দীর্ঘায়িত হয়েছে। এটা ফসলের বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তবে কৃষকের হিসাব হচ্ছে, পারিবারিক শ্রমের দাম হিসাবে ধরলে ধান চাষ অলাভজনক। এই অবস্থায়, চাষিরা ধান চাষের পাশাপাশি অন্যান্য লাভজনক ফসল, যেমন তৈলবীজ, ডাল, ভুট্টা, শাকসবজি, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি আবাদের দিকে ঝুঁকছে।

গল্পের এখানেই শেষ নয়। সাধারণভাবে এসব কৃষক হচ্ছে খণ্ডকালীন কৃষক। এদের শ্রম বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি কাজে নিয়োজিত। এরা সুবিধামতো সময় বেঁধে দিনের একটা সময় নিজের কৃষিকাজ করে (নিজের এবং বন্ধকি জমিতে), প্রয়োজনে অন্যের জমিতে শ্রমিক হিসেবে মজুরি কাজ করে। আমরা লক্ষ করেছি যে, কৃষিশ্রমের মজুরি প্রদানে নগদে লেনদেন (কমোডিফিকেশন অব লেবার) প্রচলন হয়েছে এবং আগে মজুরির সাথে যে খাবার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল তা উঠেই গেছে। এই খণ্ডকালীন কৃষকদের অনেকেই রিকশা বা ভ্যান চালিয়ে নগদ আয় করে, কেউ আবার ছোট দোকানদারি ও অন্যান্য অকৃষি পেশায় কাজ করে। আমরা আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশনায় এদেরকে বলেছি মিশ্র শ্রমিক (হাইব্রিড লেবার) (উড, ২০২২; উড এবং মণ্ডল, ২০২২)।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, নব্য কৃষকদের আগের মতো নিজেদের হাল গরু থাকার দরকার নেই এবং কৃষিকাজের জন্য হালের বলদ এখন কেউ পোষে না। এখন কৃষিতে ব্যাপক যান্ত্রিকায়ন হচ্ছে, যার ফলে ভূমিহীনদের অনেকেই বর্গাচাষ করতে এগিয়ে আসছে (সেন, ২০১৮)। ১৯৮০ দশক থেকে কৃষি উপকরণ সরবরাহে ব্যাপকভাবে যে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে তার ফলে সারা দেশে সহজে কৃষিযন্ত্র ও বীজ প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়েছে। এক সময় বলা হতো, ক্ষুদ্র কৃষকরা কি এসব যন্ত্র কিনে ব্যবহার করতে পারবে? প্রতি-প্রশ্ন হচ্ছে, সকল কৃষককে যন্ত্র কিনতে হবে কেন? আমরা আমাদের আগের গবেষণায় দেখিয়েছি এবং বর্তমান গবেষণায়ও পুনঃনিশ্চিত করছি যে গ্রামাঞ্চলের একদল কৃষি সার্ভিস প্রদানকারী এখন জমি চাষ, বপন, রোপণ, সেচ, নিড়ানি, ফসল কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই- সবই করে দিচ্ছে ভাড়ায় যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে। এটাকে আমরা আগেই বলেছি 'চাহিবা মাত্র সেবা' (কাস্টম হায়ার সার্ভিস)। উনিশ শত আশির দশকে সেচে অর্থনীতি সম্পর্কিত আমাদের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেয়েছিল যে অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রসারিত সেচ পানির বাজার যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক এবং জমির খণ্ডায়ন, অবস্থান, স্থানীয় মাটি ও ভূ-প্রকৃতিগত তারতম্যের কারণে ক্ষুদ্র কৃষকরাও নলকূপের সেচ পানির অভিগম্যতা লাভ করেছে (উড এবং পালমার জোন্স, ১৯৯১; পালমার জোন্স, ২০০১; মন্ডল, ১৯৮৭, ২০০০)। সাম্প্রতিক মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখা যায় যে ছোট কর্ষণ যন্ত্র যেমন দুই-চাকার পাওয়ার টিলার, চার-চাকার ট্রাক্টর, কম্বাইন হার্ভেস্টার, থ্রেসার এসবও এখন ভাড়া পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে (মন্ডল, বিগস এবং জাস্টিস,

২০১৭)। কাজেই একসময় যন্ত্র ছিল অবিভাজ্য; ব্যবসায়িক ব্যবহারের বিবর্তনে যত বড় যন্ত্রই হোক তার সার্ভিস এখন ছোট বড় যেকোনো কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে পরের অনুচ্ছেদে আমরা আরও বিশদ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবো। আমরা মাঠ পর্যায়ে এও লক্ষ করেছি যে, এখন কৃষককে নিজের বীজ রাখতে হয় না, বাজারে হরেক রকমের মানের বীজ পাওয়া যাচ্ছে স্থানীয় সিড ডিলারদের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে, বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ এমনকি প্রাণী খাদ্যের নিম্নমান নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।[৪]

৬। বর্গা, লিজ ও বন্ধকি কারা নেয় ও কারা দেয়?

উপরের আলোচনা থেকে একটা ধারণা পাওয়া গেলো যে সাধারণত ক্ষুদ্র কৃষকরা মধ্যম ও বড় কৃষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন চুক্তির শর্তে আবাদের জন্য জমি বর্গা বা লিজ নিয়ে থাকে।[৫] জমির উর্বরতা, স্থান ও ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এসব চুক্তির ধরন ও শর্তে ভিন্নতা দেখা যায়। উঁচু, দু/তিন ফসলি উর্বর জমি, রাস্তা ও বাজার ঘাটের কাছের জমির বার্ষিক লিজ মূল্য বিঘা প্রতি ১২ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয় বলে জানা গেছে। একটু দূরের বা এক ফসলি নিম্ন মানের জমির লিজ মূল্য কম হয়। প্রতি বছর কার্তিক মাসে রবি মৌসুমের শুরুতেই নগদে লিজের টাকা মালিককে আগাম পরিশোধ করতে হয়।

প্রশ্ন হলো, বর্গা বা লিজ কারা নেয় এবং এর প্রকারভেদ কী? যারা নেয় তারা হয় একেবারে ভূমিহীন বা তাদের অল্প কিছু জমি আছে।[৬] কিন্তু তাদের দুটো উপকরণ থাকতেই হবে। এক, তাদের পরিবারে ক্ষেতে খামারে কাজ করার শক্ত-সামর্থ্য পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক, এমনকি প্রয়োজনে ক্ষেতের কাজে সহযোগিতা করার মতো কিশোর বয়সের ছেলে মেয়ে থাকতে হবে। দুই, কৃষিকাজের জন্য অল্পস্বল্প নগদ পুঁজির সংস্থান থাকতে হবে। পুঁজির সংস্থান অনেকভাবে ঘটতে পারে। যেমন, মহিলারা ছাগল গরু হাঁস-মুরগি পালন করে কিছু আয় করে, ফাঁকে ফাঁকে কেউ রিকশা/ভ্যান চালিয়ে কামাই করতে পারে। এমনকি কারও পরিবারের সদস্য শহর বা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স টাকা পাঠাতে পারে। এরা আবার অন্যের ক্ষেতেও ভাড়া শ্রমিক হিসেবে কাজ করে মজুরি আয় করে। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, এই নব্য চাষীদের একটা বড় অংশের পুঁজির উৎস এনজিও ঋণ। পরিবারের মহিলা ও পুরুষ সদস্যগণ একাধিক এনজিও থেকে ঋণ করে এবং একটার আয় দিয়ে আরেকটার কিস্তি শোধ করে। জমি বন্ধক নিয়ে নিবিড়ভাবে কৃষিকাজ করার কাজে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগঠনে এনজিও কিস্তি সংস্কৃতির একটি বড় প্রভাব রয়েছে।

এবার দেখা যাক, জমি বন্ধক বা বর্গা কারা দেয়। এরা সাধারণত মধ্যম ও বড় কৃষক। তাদের নিজেদের যে জমি আছে তার পুরোটা বা অংশ বিশেষ নিজেদের আবাদ করতে হলে যদি তাদের নিজেদের

---

[৪] এটা এখন সাধারণ দৃশ্য যে বোরো ও আমন ধান রোপণের মৌসুমে গ্রামে গ্রামে অনেকে ভ্যানে ফেরি করে বিভিন্ন জাতের ধানের চারা ও ফল-ফুলের চারা বিক্রি করছে।

[৫] তবে লক্ষ করা গেছে যে গ্রামাঞ্চলে স্বল্প জমির মালিকরা নিজেদের জনবল বা আর্থিক সামর্থ্য নেই বলে তাদের সামান্য জমিটুকু অন্য চাষিদের কাছে সুযোগমত বর্গা বা লিজ দিয়ে দিচ্ছে। এটাকে কেউ কেউ 'উল্টো বর্গা' বা 'উল্টো বন্ধক' বলেছেন (হোসেন ও বায়েস, ২০১৫, আদনান, ২০২২)।

[৬] এক দশক আগে রাজশাহীর এক গ্রামের গবেষণায় বর্গাচাষিদের আধিক্য এবং উদ্যোক্তা কৃষকের অভাবকে কৃষি একটি ব্যবসা হিসাবে বিবেচিত না হওয়ার কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে (রহমান, ২০১৪)। আমাদের গবেষণা মতে, বর্তমানে কৃষিকাজ ব্যবসা হিসাবে গড়ে উঠছে বলেই অনেকেই জমি বন্ধক নিয়ে লাভজনক ফসল ফলাচ্ছে।

পরিবারে কায়িক শ্রম দেওয়ার মতো যথেষ্ট লোকবল থাকে তাহলে তারা তাই করে। কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এদের অনেকেরই তা নেই। বিশেষ করে যাদের ছেলে সন্তান প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে বাইরে চলে গেছে। বর্তমান সময়ে কৃষিতে যারা নিয়োজিত তারা প্রায় সবাই মধ্য বয়সী এবং অনেকেরই তেমন কোনো প্রযুক্তি জ্ঞান বা শক্তি-সামর্থ্য অবশিষ্ট নেই। কাজেই তাদের নিজেদের জমি আবাদ করার মতো প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি, সামর্থ্য বা দৈনন্দিন দেখভাল করার কোনো নিজস্ব জনবল নেই। পুরোটাই তাদেরকে শ্রমবাজার থেকে চড়া মজুরিতে কেনা শ্রমের ওপর নির্ভর করে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে হয়। স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত শ্রমিক না পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে আসা শ্রমিক চুক্তি ভিত্তিতে যোগাড় করতে হয়।[৭] এর সঙ্গে ব্যয়বহুল কৃষি উপকরণের খরচ মিটিয়ে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় কৃষিকাজ করা মোটেই পোষায় না।[৮] কেবল পছন্দমতো জাতের কিছু ধান বা সবজি বাগান করার মতো বাড়ির আশপাশের কিছু জমি রেখে দিয়ে তারা বাকি জমি নব্য কৃষকদের বর্গা বা লিজ দিয়ে দেয়। এটা আমাদের মতে জমির মালিক (রেন্টিয়ার) এবং প্রকৃত চাষি (রেন্টার/কন্ট্রাক্টর) উভয়ের জন্যই লাভজনক (উইন-উইন) অবস্থা।

আরেক শ্রেণির মালিকও জমি লিজ দিয়ে দেয়। তারা বড় ছোট সকল প্রকারের কৃষকই হতে পারে। ছোট কৃষকদের অনেকেই কৃষিকাজ করার শ্রমশক্তি থাকা সত্ত্বেও জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্ধক দিয়ে এককালীন বেশ কিছু টাকা জোগাড় করতে হয় ছেলে সন্তান, ভাই বা স্বজনদের বিদেশ পাঠানোর জন্য। বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ দিয়ে কেউ জমি ফেরত নিতে পারে, আবার কেউ না পেরে একসময় বিক্রি করে দেয়। এমন ঘটনা আমরা গবেষণা সাক্ষাৎকারে অহরহ জানতে পেরেছি। বড়দের অনেকেই জমি লিজ দেয় যেসব কারণে তার মধ্যে প্রধানত রয়েছে ছেলেপেলে বিদেশে পাঠানো, কোনো ছেলেকে ব্যবসার পুঁজি দেওয়া, মেয়ের বিয়ে, বড় ধরনের রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি। এমনকি অনেককে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার খরচ মেটাতে জমি বন্ধক রেখেছে বলে জানানো হয়েছে। এটা গ্রামীণ রাজনৈতিক অর্থনীতির সহজ পাঠ। সাধারণত গ্রামীণ প্রভাবশালীদের কাছে এটা যেমন মর্যাদার প্রশ্ন, তেমনি এটা সম্ভাবনাময় বিনিয়োগেরও উর্বর ক্ষেত্র। কে হারে কে জিতে তা কেবল ভূ-সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে নয়, এর সাথে যুক্ত হয়েছে কে কতটুকু শিক্ষা লাভ করেছে এবং শহর কেন্দ্রিক প্রশাসনের সাথে কার কতখানি সংযোগ তার ওপর।

এ বিষয়টি ছেড়ে যাবার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো যারা কেবল জমির আয় (স্ব-চাষ বা বন্ধকি আয়) থেকে জীবন নির্বাহ করছে তাদের হয়েছে মহা বিপদ। তাদের না আছে কোনো অকৃষি আয়, না আছে নিজের চাকুরি, না আছে ছেলে সন্তানদের কাছ থেকে কোনো বাড়তি আয় প্রবাহ অথবা তারা না পারে অন্য কোথাও গিয়ে কাজ করতে। এক কালের ভূ-স্বামী এই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো গ্রামীণ রাজনৈতিক কাঠামোতে একেবারেই ক্ষয়িষ্ণু শক্তি।

---

[৭] এই গবেষণায় দেখা গেছে, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুড়া, দিনাজপুর- এসব অঞ্চলে কেনা বাইরে থেকে আসা শ্রমিকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সম্বলিত সংগঠিত বাজার (কামলার হাট) গড়ে উঠেছে, যেখান থেকে মালিকেরা প্রয়োজনমতো শ্রমিক কিনে নিয়ে যায়।

[৮] কাজেই আদনান (২০২২) এর মতে 'তুলনামূলকভাবে বিত্তশালী কৃষকেরা ক্ষুদ্র মালিকদের জমি ভাড়া করে তা ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ করায় মুনাফ অর্জনের জন্য'-এ কথা এখন প্রযোজ্য নয়। আসলে, কৃষি শ্রমিকের মজুরি, পারিবারিক শ্রমের অভাব ও পরিচালন অসুবিধার কারণে এমনটা হচ্ছে।

জমি লিজ বা বন্ধকির মেয়াদ ও শর্তাবলির ভিন্নতা রয়েছে। প্রথমত, ছোট ছোট এই নব্য কৃষকদের বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিমাণ যেহেতু কম, তাই তারা এক বছর মেয়াদি বন্ধক নিতে বেশি আগ্রহী থাকে। বিশেষ করে স্থান ভেদে এসব চুক্তিকে সন-কড়ালি, পচানি, খায়-খালাসি, বন্ধক, ছোট কট ইত্যাদি নাম রয়েছে। প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে রবি মৌসুমের শুরু থেকে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক দাতাকে নির্ধারিত টাকা এককালীন নগদ প্রদান করে থাকে এবং এক বছর শেষে জমির মালিক জমি ফেরত নিয়ে নিবে এই শর্তে। তবে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রতি বছর সন-কড়ালি চুক্তির নবায়ন হতে পারে। এই এক বছরে তারা জমি থেকে একটার পর একটা ফসল ফলিয়ে বন্ধকের টাকা উঠিয়ে যত বেশি পারে লাভ করতে সচেষ্ট থাকে। আলাপচারিতায় শোনা গেছে, বন্ধক নেওয়া ক্ষুদ্র চাষীরা পনেরো দিনের বেশি কোনে জমি খালি রাখে না, কিছু না কিছু ফসল তারা ফলাবেই। আগেই বলেছি, সেচ ও যন্ত্র সহযোগে কর্ষণ সুবিধা এবং রবি মৌসুম প্রলম্বিত হওয়ায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা এখন সহজ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, যাদের সাংসারিক উৎসের বাইরে অন্য কোনো উৎস থেকে এককালীন টাকার সংস্থান হয়, তারা দীর্ঘমেয়াদি বন্ধক বা লিজ নিতে বেশি আগ্রহী। এ ধরনের লিজের নিয়ম হচ্ছে বন্ধকদাতা যতদিন বন্ধকের সমুদয় টাকা ফেরত না দিবে ততদিন বন্ধক গ্রহীতা জমি ভোগ করতে থাকবে। এজন্য দীর্ঘ মেয়াদি বন্ধকের মূল্য অনেক বেশি হয়। আমাদের গবেষণায় জানা গেছে যে, স্থান ও জমির প্রকারভেদে বর্তমানে বিঘা প্রতি দীর্ঘমেয়াদি লিজ মূল্য ২ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত চালু আছে। স্থানীয় ভাষায় দীর্ঘমেয়াদি লিজের অনেক নাম রয়েছে, যেমন দায়শোধী, কট-কওলা, এগ্রিমেন, বড় কট ইত্যাদি। তৃতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি বন্ধকি তারাই নিতে পারে যাদের হাতে এককালীন বেশ কিছু টাকা জমা থাকে। যেমন বিদেশে অবস্থানরত সন্তানসন্ততির পাঠানো অর্থ, মোটা তাজা করা গরু ছাগল বা গৃহাঙ্গনের বড় গাছ বিক্রিলব্ধ অর্থ, ভ্যান চালনা বা ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে অর্জিত জমানো টাকা ইত্যাদি উৎস প্রধান। দীর্ঘমেয়াদি লিজ চুক্তিবদ্ধ জমিতে সাধারণত ফলের বাগান বা মাছের পুকুর করা হয় এবং এ কারণেই দীর্ঘমেয়াদি লিজ গ্রহীতারা সাধারণত একটু সচ্ছল পরিবারের এবং খামার পরিচালনা সম্পর্কে তাদের কিছু বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। চতুর্থত, আমরা এটাও লক্ষ করেছি, গ্রামে বসবাসকারী অথবা অনুপস্থিত বিত্তবান অনেকেই সঞ্চিত টাকা ব্যাংক বা অন্য কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে গ্রামে আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে জমি বন্ধক নিয়ে টাকা খাটাচ্ছে এবং নিয়মিত জমির খাজনা হিসেবে নগদ টাকা কামাই করছে। একদিকে টাকাটা বিনিয়োগ হয়ে আছে এবং অন্যদিকে বন্ধকদাতা যদি আর জমি ফেরত নিতে না পারে তাহলে একদিন সুযোগমতো জমিটা পুরোপুরি কিনে ফেলার সম্ভাবনাও থেকে গেল। আবার এও দেখা গেছে, এদের অনেকেই এভাবে বন্ধক নেওয়া জমি নিজেরা আবাদ না করে অন্য কৃষক যাদের পারিবারিক শ্রমশক্তি রয়েছে তাদের কাছে বছর মেয়াদি লিজ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট হারে নগদ অর্থ অর্জন করে থাকে। নিঃসন্দেহে এটা ব্যাংক সুদের চেয়ে অনেক বেশি এবং নিবিড় অন্তঃ ও আন্তঃসম্পর্কিত পারিবারিক সামাজিক পরিমণ্ডলে এটা মোটামুটি ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ। এটাকে আমরা শৃঙ্খলযুক্ত বন্ধক (চেইন্ড মর্টগেজ) হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

৭। খণ্ডিত জমির পরিচালনগত একত্রীকরণ (অপারেশনাল কনসলিডেশন)

আমাদের দেশের কৃষি খামারগুলো কেবল আকারে ক্ষুদ্র নয়, এগুলো আবার বহু খণ্ডে বিভক্ত। সাধারণত একই কৃষকের চাষাধীন নিজের জমি বা বন্ধক/বর্গা নেওয়া জমি একই মাঠে এবং অন্য মাঠেও

বহু খণ্ডে বিস্তৃত থাকে। যার জমি যত বেশি তার খণ্ডও তত বেশি। এই খণ্ডায়ন আপাতদৃষ্টিতে সময়ের অপচয়, সঠিকভাবে ফসলের পরিচর্যা ও যত্নআত্তি করা এবং একক ব্যবস্থাপনায় বিভাজ্য যন্ত্রের (লাম্পি মেশিন) দক্ষ ব্যবহার করার পথে বিরাট বাধা হিসেবে দেখা হতো। ফলে জমির উৎপাদিতা ও উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা বিঘ্নিত হতো এবং এখনও কিছুটা হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত বিষয়টার একটি প্রায়োগিক সমাধান পাওয়া গেছে স্থানীয় প্রযুক্তি সেবাদানকারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে। যেমন ধরা যাক অগভীর নলকূপের মালিকের কথা, যিনি নিজের মেশিনের আওতায় সেচের জমির পরিমাণ বাড়ানোর স্বার্থে বিভিন্ন কৃষকের চতুর্দিকে ছড়ানো খণ্ড খণ্ড জমিগুলোকে একত্রীভূত করে একটি একক সেচ সীমানা (কম্যান্ড এরিয়া) তৈরি করেন। তাতে একদিকে নলকূপের পানি উত্তোলন করার ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হয় এবং অপরদিকে কম্যান্ড এরিয়াভুক্ত সকল জমি সেচের আওতায় আনতে পারায় সেচ মালিকের সেচ পানি বিক্রি থেকে মোট মুনাফাও বৃদ্ধি পায়। আমাদের আগের গবেষণায় দেখিয়েছি, এতে কারও কারও মতে জলস্বামী (ওয়াটার লর্ড) তৈরি হয়নি বরং ক্ষুদ্র চাষীরা খণ্ডায়িত জমিতে সেচের উপকারভোগী হতে পেরেছে। এখানে ব্যক্তির লাভ ও সামাজিক লাভ দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক একইভাবে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ও কম্বাইন হার্ভেস্টার মালিকগণ বিভিন্ন মাঠে বহু সংখ্যক কৃষকের এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত জমিতে ঘুরে ঘুরে চুক্তি অনুযায়ী উদ্দিষ্ট সেবা প্রদান করে থাকে। এর ফলে পাওয়ার টিলার বা হার্ভেস্টার মেশিনের যে নির্ধারিত ক্ষমতা তার অনেকটাই ব্যবহার করা যায় বলে মালিকগণ তাদের বিনিয়োগের লাভ তুলে নিতে সক্ষম হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সব জমি এক জায়গায় একত্রিত করে একই সময়ে পরিচালন করতে পারলে সবচেয়ে উত্তম হতো; কিন্তু পারিবারিক খামারের একক ব্যবস্থাপনার প্রতি ঐতিহ্যগত টান থাকার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবে তা সম্ভব নয় বলে 'অপারেশনাল কনসলিডেশন' কে আমরা দ্বিতীয় উত্তম সমাধান বলে মনে করছি। এটাকে খামারের একত্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থাপনার উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। অন্যত্র আমরা এটাকে জমির মালিক-চুক্তিদার মডেল (রেন্টিয়ার-কন্ট্রাক্টর মডেল) হিসেবে আখ্যায়িত করেছি (উড এবং মন্ডল, ২০২২)। এই একত্রীকরণের কঠিন কাজটি বাংলাদেশের কৃষকরা করেছে বণ্টনধর্মী ভূমি সংস্কার ছাড়াই। আর এজন্যই এটাকে আমরা বাংলাদেশি কৃষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত মডেল বলে অভিহিত করেছি। আমরা বৃহৎ আকারের খামার বা উচ্চ ভর্তুকি যুক্ত বৃহদাকার মেশিন চালিত পাঞ্জাবি মডেলের কৃষি অনুসরণ করিনি, করা সম্ভবও হয়নি।

৮। সনাতন পারিবারিক খামারের অবসান ও নব-সঞ্চালিত খামারের আবির্ভাব

সনাতন ব্যবস্থায় প্রধানত নিজেদের খোরপোশ লক্ষ্য নিয়ে পারিবারিক পর্যায়ে খামার ব্যবস্থাপনা হতো মূলত পরিবারের হাল-গরু, শ্রম, বীজ এসব দিয়ে। যাদের জমি বেশি ছিল তাদেরকে পরিবারের শ্রমের সাথে মজুরি শ্রমও কিনতে হতো। এটাকে আমরা সনাতন পারিবারিক খামার (ট্র্যাডিশনাল ফ্যামিলি ফার্ম) হিসেবে অভিহিত করেছি। এ ব্যবস্থার এখন অবলুপ্তি বা অব-সঞ্চালন ঘটছে, যাকে আমরা (ডিস-আর্টিকুলেশন অব ফার্ম ম্যানেজমেন্ট) বলেছি। সেটা এখন বদলে যাচ্ছে এভাবে যে কর্ষণ শ্রমিক ও হালের বলদের জায়গায় এখন পাওয়ার টিলার/ ট্রাক্টর এসেছে, বৃষ্টির উপর নির্ভরতার বদলে এখন কৃত্রিম সেচ ব্যবহার হচ্ছে, নিজের ঘরে মহিলাদের কষ্টসাধ্য বীজ সংরক্ষণের পরিবর্তে এখন বাজার থেকে পছন্দমতো হরেক রকমের উফশী বীজ কিনে ব্যবহার করা যাচ্ছে, হাতে নিড়ানোর পরিবর্তে এখন আগাছানাশক ব্যবহৃত হচ্ছে, শ্রমিকের হাতে ধান কাটার পরিবর্তে এখন হার্ভেস্টার দিয়ে ধান কাটা হচ্ছে এবং গরু দিয়ে বা হাতে পিটিয়ে ধান গম মাড়াইয়ের পরিবর্তে এখন থ্রেসার যন্ত্র সহযোগে মাড়াইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটাকে আমরা খামার ব্যবস্থাপনার নব-সঞ্চালন (রি-আর্টিকুলেশন) বলেছি। শ্রমের বাজারেও

এই ধরনের নব-সঞ্চালন দেখতে পাই। যেমন, আগের মতো সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কামলা শ্রমিকের কাজের পরিবর্তে সকালে নাস্তা খেয়ে দেয়ে শ্রমিক ক্ষেতে যায় এবং এখন ঘড়ি ধরে দুইটা/আড়াইটা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ শেষে বিদায় হয়। মজুরি পুরোটা নগদে, আগের মতো মালিক কর্তৃক খাবার দেওয়ার রীতি উঠে যাচ্ছে। তবে বাইরের 'বিদেশি' শ্রমিকের কথা আলাদা। তারা যেহেতু মালিকের বাড়িতেই থাকে সেহেতু তাদেরকে নগদ মজুরির সাথে তিন বেলা খাবারও দেওয়া হয়। এই ডিস-আর্টিকুলেশন/রি-আর্টিকুলেশনের লক্ষণগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় যে, সাধারণ কৃষকরাও ফসল ওঠার পরপরই তা ক্ষেত থেকেই বিক্রি করে বাড়িতে সংরক্ষণের ঝামেলা থেকে মুক্ত হচ্ছে। মহিলাদের ঢেঁকিতে চাল ভানার কাজ বহু আগেই বিদায় হয়েছে। অনেকেই এখন ধান বিক্রি করে দিয়ে বাজার থেকে পছন্দমতো মানের প্যাকেটজাত মেশিন ছাঁটা চাল কিনে আনছে। বড়জোর যাদের পরিবারে মহিলা শ্রমশক্তি ও লাকড়ি চুলার ব্যবস্থা আছে, তারা বাড়িতে ধান সিদ্ধ করে চালকলে নিয়ে গিয়ে ছাঁটাই করে আনছে। এতে কিছুটা অর্থ সাশ্রয় হয় এবং নিজেদের ক্ষেতে উৎপাদিত পছন্দমতো চালের ভাত খাওয়া সম্ভব হয়। এটাতে কিছুটা পারিবারিক খামারের বিশেষত্ব বিদ্যমান থাকলেও সামগ্রিক কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে বাণিজ্যিক কৃষির দিকে জোর প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৯। বাণিজ্যিক কৃষিতে পুঁজি, নতুন খেলোয়াড়ের সমাগম ও কে কত পায়?

বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিবারের নিজস্ব উপকরণ ব্যবহার কমে গিয়ে বাজার-নির্ভর উপকরণ ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বাজারে বিভিন্ন কৃষিসেবা প্রদানকারী নতুন নতুন নায়ক নায়িকার (এক্টর্স) আবির্ভাব ঘটছে।[৯] মোটা দাগে এদের মধ্যে রয়েছে নব্য কৃষক, মজুরি শ্রমিক, পরিবহণ সেবা প্রদায়ক, বীজ-সার-কীটনাশক ব্যবসায়ী, প্রাণী খাদ্য ও ভ্যাকসিন উৎপাদক ও বিক্রেতা, প্রাইভেট ভ্যাক্সিনেটর ও প্রজনন কর্মী এবং সেচ, কর্ষণ, বীজ বপন/রোপণ, ফসল কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই ইত্যাদি যন্ত্রের মালিক, চালক ও মেকানিক। সেই সঙ্গে আছে হাজার হাজার কৃষিযন্ত্র আমদানিকারক, বিক্রেতা, যন্ত্রাংশ মেরামতের ওয়ার্কশপ। এছাড়াও রয়েছে ফল ফসলের ফড়িয়া ব্যাপারী, আড়তদার, চুক্তিদার খামারি, মৎস্য পোনা ও ফল বৃক্ষের নার্সারি মালিকগণ। এদের মধ্যে অনেকের ব্যবসা বেশ বড় এবং বহুধা বিস্তৃত। তাদের পুঁজির উৎস ব্যাংকসহ বহুবিধ। এও দেখা গেছে, গ্রামের হাটবাজারে বিপণন প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যারা যুক্ত রয়েছে তারা বৃহৎ পুঁজি ও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের সাথে সংযুক্তদের সাথে প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে প্রান্তিক পর্যায়ে চলে যায়।

আরেকটি ব্যাপারও লক্ষণীয়। বহিরাগত বড় যন্ত্রের মালিকরা স্থানীয় পর্যায়ে চুক্তি ভিত্তিতে সেবা প্রদানের ব্যবসার জন্য সম্ভাব্য সেবা ব্যবহারকারী কৃষকদের সাথে প্রাথমিক সংযোগ স্থাপন ও পরবর্তীতে নির্বিঘ্নে ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে স্থানীয় চেনাজানা আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকে ব্যবসায়ী এজেন্ট নিয়োগ করে। কম্বাইন হার্ভেস্টার, বড় ট্রাক্টর, মাটি খনন, মাটি ভরাট, বিকো যন্ত্র ইত্যাদির বেলায় এটা বেশি ঘটে। বিশেষ করে কম্বাইন হার্ভেস্টার এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে চুক্তি ভিত্তিতে ধান গম কাটার

[৯] বেশ আগের পিএইচডি গবেষণায় আতিউর রহমান (১৯৮৬) চাষিদের শ্রেণি বিভাজন বিশ্লেষণে বাংলাদেশের কৃষিতে পুঁজিবাদী রূপান্তরের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে ক্ষুদ্র কৃষির আঙ্গিকে প্রযুক্তি বিকাশের নিজস্ব ধারা আলোচনার ওপর কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে মার্কসীয় উৎপাদন সম্পর্ক, চাষীদের নিঃস্বকরণ, শ্রমের শোষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

কাজে গমনাগমনের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী কোনো না কোনো মধ্যস্বত্ব এজেন্টের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের মাঠ সফরে জানা গেছে, হার্ভেস্টার মেশিন মালিকদের মধ্যে কে কোথায় ধান গম কাটতে পারবে- এ নিয়ে প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এজন্য ইতোমধ্যে অঞ্চলভিত্তিক কম্বাইন হার্ভেস্টার সমিতি গড়ে উঠছে এবং ব্যস্ত মৌসুমে কোন অঞ্চলের মেশিন কোথায় গিয়ে ধান কাটার কাজ করতে পারবে, সেটার তদারকি ও মধ্যস্থতা করার কাজে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্পৃক্ত হয়েছে। এসব বড় মেশিন যেহেতু সরকারি ভর্তুকি দিয়ে বিতরণ করা হচ্ছে, তাই এসবের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা সরকারি সংস্থার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে সরকারি এই হস্তক্ষেপ ক্ষমতার অপব্যবহার বা কোনো প্রকার অনানুষ্ঠানিক খাজনা আদায় (রেন্ট সিকিং) বা হার্ভেস্টারের অবাধ চলাচল ও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবহারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা তা দেখার বিষয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত সম্পর্কের নিবিড় জাল এখনও যেভাবে বিস্তৃত, তাতে করে কৃষি যন্ত্র সেবার ভৌগোলিক আওতা বা প্রসার নিয়ে তেমন কোনো দ্বন্দ্ব বা শহরের মতো গ্রামাঞ্চলে এখনও মাস্তান সংস্কৃতির উপস্থিতি তেমনটা লক্ষণীয় হয়নি। তবে ইদানিং বগুড়া অঞ্চলে ক্ষেত থেকে আলু তোলার পর কৃষক ও আলু বেপারীদেরকে চাঁদাবাজির কবলে পড়তে হচ্ছে বলে গণ-মাধ্যম সূত্রে জানা যায়।

আমাদের কৌতূহলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পরিবর্তিত বাণিজ্যিকায়িত কৃষির আয় থেকে কে কতটা লাভবান হয়ে থাকে তা দেখা। এজন্য যে বিস্তারিত জরিপের প্রয়োজন তা করা সম্ভব ছিল না। তবুও প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি আমরা সীমিতাকারে কিছু পরিমাণগত তথ্য জোগাড় করেছি প্রধান ফসল বোরো ধানের আয়-ব্যয় সম্পর্কে। আমাদের হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বোরো ধান আবাদের কাজে কৃষকের যে খরচ হয় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চলে যায় কেনা শ্রমিকের মজুরি দিতে এবং ২৭ শতাংশ ফিরে আসে পারিবারিক শ্রমিকের খরচ হিসেবে। এই হিসেবে প্রায় ৬০ শতাংশ উৎপাদন খরচ হয় কেবল শ্রমের পেছনে। কর্মসংস্থানের দিক থেকে এটা ইতিবাচক, যদিও কৃষি শ্রমিকের প্রাপ্যতা দিন দিন বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। এরপর প্রায় এক-চতুর্থাংশ চলে যায় চুক্তিভিত্তিতে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের খরচ হিসেবে এবং বাদবাকী প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় হয় অন্যান্য উপকরণ যেমন বীজ, সার, কীট ও আগাছানাশকের নগদ খরচ হিসেবে। এখান থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সনাতন পারিবারিক খামার ব্যবস্থায় যেখানে উৎপাদন খরচের প্রায় পুরোটাই নির্বাহ হতো পরিবার থেকে, এখন নব-সঞ্চালিত বাণিজ্যিকায়িত পারিবারিক খামারে তা উল্টে গেছে। এখন কৃষিতে কেনা শ্রমের পরিবর্তে পুঁজির অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। আর এ কারণেই বাণিজ্যিকায়িত কৃষিতে নগদ পুঁজি ও অর্থসংস্থানের গুরুত্ব এতটা বাড়ছে। তাই নব্য কৃষির অগ্রগতি আরও টেকসই ও লাভজনক করতে আমাদের কৃষিতে পুঁজি সংগঠনের ধারণা ও কৌশলের পরিবর্তন নিয়ে ভাবতে হবে।

এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক কৃষি আয়ের বণ্টন কীভাবে হয়। আমরা খুব সহজ একটা হিসাব করে দেখেছি যে মোট আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চলে যায় কৃষিযন্ত্র সেবা প্রদানকারী ও উপকরণ ব্যবসায়ীদের কাছে, প্রায় এক-চতুর্থাংশ আয়ের হিস্যা পায় মজুরি শ্রমিকরা এবং প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আয় ফিরে আসে পারিবারিক শ্রমের মূল্য হিসেবে। আমাদের হিসাবে দেখা গেছে, বোরো ধান আবাদে পারিবারিক শ্রম

বাবদ মোট খরচের ২৭ শতাংশ ব্যয় হলেও তা আয়ের হিস্যা পায় মাত্র ১৯ শতাংশ। বাকি আয় বণ্টিত হয় জমির বন্ধকি মূল্য ও অপরিমাপযোগ্য খরচ (ইন্ট্যাঞ্জিবল কস্ট) হিসেবে।[১০] এখান থেকে বোঝা যায়, প্রকৃত অর্থে পারিবারিক শ্রমকে বিদ্যমান মজুরি হারের চেয়ে অনেক কম হারে মূল্যায়িত হতে হয়। আর এখানেই নিহিত রয়েছে কেন বাংলাদেশে কৃষিতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি হলেও কৃষকের কেন ততটা উন্নতি হয় না।

১০। জমির প্রতি এত প্রগাঢ় মায়া কেন?

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেলো যে, যাদের জমি আছে, কিন্তু সেগুলো দেখাশুনা করার লোক নেই তারাই মূলত জমি বর্গা/বন্ধক দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে তারা জমি বিক্রি করে দিয়ে ঝামেলামুক্ত হয় না কেন? আমাদের কৃষক বৈঠকগুলোর প্রতিধ্বনি হচ্ছে, 'জমির প্রতি মায়া হচ্ছে সন্তান পালনের মতো। কোনো না কোনোভাবে তা প্রতিদান হিসেবে একদিন কিছু না কিছু দিবেই দিবে। জমি উর্বর অনুর্বর যাই হোক, মালিককে কখনও তা বঞ্চিত করে না'। এটাকেই আমরা বলেছি জমির প্রতি প্রগাঢ় মায়া। পৌরাণিক লেখায় ভূমিকে মায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সকল বিপদে শেষ আশ্রয় এক খণ্ড জমি। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ কালে কাজকর্ম হারিয়ে অসংখ্য মানুষ শেষ পর্যন্ত শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেছে শুধু ঐ জমির টানে, কেবল আশ্রয়ের আশায় নয়, জীবন ধারণের অবলম্বন হিসেবে।[১১]

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জমির প্রতি আকর্ষণ কেবল আবেগ তাড়িত নয়। জমি দুর্দিনের আশ্রয় এবং নিরাপত্তাও বটে। গ্রামাঞ্চলে না হয় এটা সামাজিক মর্যাদার প্রতীক, কিন্তু শহরাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও জমিতে বিনিয়োগ করার প্রবণতা বেশ তীব্র এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে জমিতে বিনিয়োগকে সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক মনে করা হয়। জমির দামে কখনও অবমূল্যায়ন হয় না। বিশেষ করে দ্রুত প্রসারমান নগরায়ণের যুগে জমির মূল্যমান দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই শেষ পর্যন্ত মানুষ চেষ্টা করে যায় শত বিপদেও জমি বিক্রি না করে ধরে রাখতে। প্রক্রিয়াটা এ রকম। প্রথমে বছর মেয়াদি লিজ, তাতে প্রয়োজন না মিটলে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধক আর তাতেও না কুলালে শেষমেশ বিক্রি। জমিতে বিনিয়োগ করে রাখার একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তাৎপর্যও থাকতে পারে। শহুরে অনেক ব্যবসায়ী বিত্তশালী, যারা রাজনৈতিক শক্তি বলয়ের সাথে কোনো না কোনো ভাবে সম্পৃক্ত, তারা গ্রামে জমি কিনে বা বন্ধক রেখে সেখানে নামকা ওয়াস্তে মৎস্য পুকুর, ফলের বাগান বা নার্সারি করে রাখে এবং এগুলো থেকে বর্তমানে ফলাফল যাই পাওয়া যাক না কেন দুটো উদ্দেশ্য সাধনে এটা খুব কাজে দেয়। একদিকে এটার অতি মূল্যায়িত আয় (প্রায়শ কৃত্রিম) দেখিয়ে অন্যান্য আয়ের ওপর অর্পিত আয়কর মওকুফের সুযোগ নেওয়া যায়,[১২] অন্যদিকে জমিগুলো উচ্চ মূল্যে বন্ধক দলিল করে ভবিষ্যৎ সম্পদ হিসেবে আটকে রাখা সম্ভব হয়। স্বপন আদনান চরাঞ্চলে ভূমি গ্রাসের যেসব গল্প আগে শুনিয়েছেন সেগুলোর সাথে আধুনিক

---

[১০] তথ্যের অভাবে মাঠ ফসলের বাইরে বন্ধকি জমিতে শাকসবজি, ফলবাগান ও মৎস্যচাষের আয়-ব্যয় হিসাব করা যায়নি। সম্ভবত এসব শ্রমঘন বাণিজ্যিক কৃষিতে বিনিয়োগের আয়ে শ্রমের হিস্যা আরেকটু বাড়তে পারে।

[১১] জমি কেবল শক্তি নয়, এটা শত্রুতারও উৎস এবং জমিতে অধিকার থাকা না থাকার ন্যায়তা অন্যায্যতার বিষয়টি যুগে যুগে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে অভিমত রয়েছে (বিল্লাহ, ২০২১)। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ও ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা হয়েছে (দেবনাথ, ২০১৯; বারকাত ও অন্যান্য, ২০২২)।

[১২] অর্থনীতিতে নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন বিষয়ে অন্যত্র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (মণ্ডল, ২০১৯)।

কৃষির নামে এটাও এক ধরনের ভূমি দখল বলা চলে।[১৩] তাহলে জমির প্রতি এত আকর্ষণ কী আর কিছু ইঙ্গিত করে? একটি সম্ভাব্য জবাব হতে পারে যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যদি ব্যবসা সুশাসন ও নিশ্চিন্তে সঞ্চয় বিনিয়োগ করার বিকাশ পরিবেশ বহুলাংশে কার্যত অনুপস্থিত থাকে,[১৪] সেক্ষেত্রে আপাত নির্ভরযোগ্য শেষ ভরসা হিসেবে জমির প্রতি টানটাকেই মানুষ উপজীব্য করে রাখতে চায়।

১১। খামার আয়তন-উৎপাদিতার ঋণাত্মক সম্পর্কের বিতর্ক

খামার আয়তন-উৎপাদিতার ঋণাত্মক সম্পর্কের বিতর্ক বহু পুরানো। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খামার বিশিষ্ট কৃষির পরিপ্রেক্ষিতে আগের বহু সংখ্যক প্রকাশনায় খামারের আয়তনের সাথে জমির একক প্রতি উৎপাদিতার ঋণাত্মক সম্পর্ক দেখা গেছে (সেন, ১৯৬২; হোসেন, ১৯৭৪)। যদিও বাংলাদেশের পরবর্তী মাঠ পর্যায়ের জরিপলব্ধ প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী কেবল খামার আয়তন নয়, একই সঙ্গে খণ্ডিত জমি, জমির মালিকানা/বর্গা ব্যবস্থা এবং ফসলের ব্যস্ত ও অবসর মৌসুমে (পিক অ্যান্ড স্ল্যাক সিজন) উৎপাদকের শ্রম ব্যবহারের ধরন বিবেচনায় নিলে উৎপাদিতার ঋণাত্মক সম্পর্কটি অতটা সরলীকৃত প্রমাণিত হয়নি; বরং দেখা গেছে যে সাধারণত অতি ক্ষুদ্রায়তনের খামারে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং খণ্ডায়িত খামারের আয়তন একটি পর্যায় অতিক্রম করলে সাধারণত সনাতন কৃষিতে মধ্যম ও বড় চাষীদের বেলায় ঋণাত্মক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় (মণ্ডল, ১৯৮০a)। এখন কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রধানত সে কারণে খামারের আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনাগত আকার (স্কেল ইকনোমি) পরিবর্তিত হয়েছে। মাহবুব হোসেন প্যানেল ডাটা ব্যবহার করে বিশ্বব্যাংকের গবেষণাও দেখিয়েছে, বাংলাদেশে খামারের গড় আয়তন হ্রাস পেলেও একর প্রতি ফলন বা উৎপাদিতার ওপর এর আপাত কোনো প্রভাব পড়েনি বরং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ও দক্ষতার ওপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলেছে। এ গবেষণায় এটাও দেখানো হয়েছে, আমাদের কৃষিতে মোট উৎপাদন উপকরণের উৎপাদিতা (টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাক্টিভিটি) ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাত্র ০.২ শতাংশ হারে বেড়েছিল এবং এরপর থেকে ২.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রধানত কৃষিতে বৈচিত্র্যায়ন বৃদ্ধির ফলে (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)। আমাদের গবেষণা বলছে, বাজার তাড়িত কৃষিসেবা প্রদান (মার্কেট লেড সার্ভিস প্রভিশন) ও কৃষি যান্ত্রিকায়ন প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের ফলে উৎপাদিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খামারের ক্ষুদ্রায়তনিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যন্ত্রসেবা প্রদানকারীদের খণ্ডায়িত জমির পরিচালনগত উদ্ভাবনী একত্রীকরণ (অপারেশনাল কনসলিডেশন) উদ্যোগের ফলে উৎপাদন দক্ষতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২। বৃহৎ কর্পোরেট কৃষির উত্থানের সংকট ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে যখন পরিবার কেন্দ্রিক নব-সঞ্চালিত ব্যবস্থাপনায় ১ কোটি ৭৫ লাখ কৃষি খামার পরিচালিত হচ্ছে, কর্পোরেট কৃষি ও চুক্তিবদ্ধ খামারও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। প্রথমত, আলু, ভুট্টা, সুগন্ধি চাল, মশলা জাতীয় ফসল, পোল্ট্রি মাংস ও ডিম উৎপাদন, উন্নত বীজ উৎপাদন ইত্যাদি লাভজনক

[১৩] আমাদের গ্রাম সফরে মাল্টা বা ড্রাগন ফল বাগানের নামে এমন সম্ভাবনার কথা বেশ কিছু ক্ষেত্রেই শোনা গেছে। আমাদের এগ্রো বিজনেস কোম্পানিগুলোর বিষয়ে তেমন কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

[১৪] গুনার মিরডাল তাঁর এশিয়ান ড্রামা বইতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্বলতা বোঝাতে কোমল রাষ্ট্র, যেখানে আইনকানুন ঢিলাঢালা থাকে তা বুঝিয়েছেন।

কৃষি পণ্য চুক্তি ভিত্তিতে উৎপাদন ও বিপণন করতে বেশ কিছু ছোট বড় এগ্রো ফার্ম এগিয়ে এসেছে।[১৫] দেশীয় চাহিদা পূরণ ছাড়াও তারা রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করছে। দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আম, ভুট্টা, মশলা পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজেও বিনিয়োগ করছে। তৃতীয়ত, এরা ছোট বড় কৃষকদের সংগঠিত করে উন্নত প্রযুক্তি, পরামর্শ ও উপকরণ সরবরাহ করে পণ্য তৈরি করছে এবং তাতে জমির ফলন ও পণ্যের মান এ দুটোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থত, তাদের অনেকেই বিভিন্ন কৃষকের কাছ থেকে জমি দীর্ঘ মেয়াদে লিজ নিয়ে যথাসাধ্য একত্রিত করে তাদের পছন্দমতো ফসল ফলাতে পারছে এবং চুক্তি অনুযায়ী কৃষকের পণ্য কিনে নিচ্ছে। তবে প্রধান খাদ্য শস্য ধান চাষের বেলায় এমন কোনো বড় কর্পোরেট উদ্যোগ এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। এই চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে 'লাভ-লাভ' অবস্থা মনে হলেও কারও কারও মনে সন্দেহ জেগেছে যে, বড় কর্পোরেটরা 'জমি অধিগ্রহণের রাজনীতি' ব্যবহার করে একদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষিদের জমি গ্রাস করে নিতে পারে (মোর্শেদ, ২০২২)। আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, কর্পোরেটরা এভাবে ক্রয়কৃত বা দীর্ঘমেয়াদি বন্ধকি জমিতে যেসব পণ্য উৎপাদন করবে তা কি কেবল রপ্তানি বাজার নাকি অভ্যন্তরীণ বাজারেও পাওয়া যাবে? আধুনিক কৃষির বিকাশে কর্পোরেটদের ভূমিকা সম্ভাবনার হাতছানি দিলেও সাম্প্রতিক সময়ে চালের বাজার ও সরবরাহ শৃঙ্খল বৃহৎ চালকল মালিকদের পুরো নিয়ন্ত্রণে এবং সেই কারণে চালের বাজার দামে অস্থির ঊর্ধ্বগতির জন্য তারা দায়ী--এমন অভিযোগের ফলে কৃষিতে কর্পোরেট ব্যবসার প্রবেশ নিয়ে অনেকেরই দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ রয়েছে।

আমাদের গবেষণার মাঠ পর্যায়ের আলাপচারিতায় ফুটে উঠেছে যে, স্বল্প খণ্ডায়িত জমির ব্যবস্থাপনাগত একত্রীকরণের মাধ্যমে আধুনিক স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রমাণিত দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে তাত্ত্বিকভাবে কর্পোরেট কৃষির পক্ষে সমর্থন থাকলেও কৃষক পর্যায়ে কর্পোরেট কৃষির প্রসারে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, অসংখ্য চাষির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডায়িত জমির মালিকানা ঠিক রেখে কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজনে কর্পোরেট খামারের আয়তন বাড়ানোর লক্ষ্যে একত্রীকরণের কাজটি বেশ কঠিন এবং এর জন্য দেনদরবার ও আইনসম্মত চুক্তি সম্পাদন (নিগোসিয়েশন অ্যান্ড লিগ্যাল কন্ট্রাক্ট) বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, জমির প্রতি আজন্ম মায়া এবং সেই সঙ্গে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে নিজে চাষাবাদ করে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও স্বকর্মসংস্থান করা- দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়ায় কোনো বড় কর্পোরেট কোম্পানির কাছে কৃষকরা তাদের জমি তুলে দেওয়া কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে। তৃতীয়ত, ক্রমাগত আবাদি জমি হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও পুঁজি ব্যবহারের সক্ষমতা বৃহৎ কোম্পানিগুলোর রয়েছে। তবুও তারা প্রধান খাদ্য শস্য ধান উৎপাদনে এগিয়ে আসছে না, যেহেতু এটা তেমন লাভজনক নয়। আবার কেউ কেউ এটাও মনে করেন যে তারা অ-ধান্য ফসল বা রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে যদি ধানের জমিকে ঐসব অর্থকরী ফসলে রূপান্তরিত করে তাহলে পারিবারিক ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা-দুটোই বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। চতুর্থত, অ-ফসল খাত যেমন পোল্ট্রি, দুগ্ধ, মৎস্য উৎপাদনে বৃহৎ কোম্পানিগুলোর যে অভূতপূর্ব সাফল্য ও অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার জন্য অত জমির প্রয়োজন পড়েনি, কেননা এসব খামার সুনিয়ন্ত্রিতভাবে উল্লম্বিকভাবে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু বৃহদাকারের ফসল উৎপাদন খামার গড়ে তোলার জন্য জমির আনুভূমিক সম্প্রসারণ দরকার এবং আর এখানেই সমস্যা যা আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈরী আবহাওয়া,

[১৫] প্রাণ, এসিআই, স্কয়ার, ব্র্যাক, ইস্পাহানি এগ্রো, এ. আর. মালিক সীড, লাল তীর, সুপ্রিম সীড, আগা খান এগ্রো, আফতাব পোল্ট্রি, কাজী ফার্ম, প্যারাগন পোল্ট্রি ইত্যাদি বড় এগ্রো বিজনেস কোম্পানি বাণিজ্যিক কৃষিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

বন্যা, খরা ইত্যাদি কারণে ফসলহানির ঝুঁকিতো রয়েছেই। তাই টেকসই এবং অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার জন্য কর্পোরেট কৃষি প্রসারের দ্রুত সম্ভাবনা একটি বিরাট প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে।

১৩। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র চাষিদের ভবিষ্যৎ কোন পথে?

মোট পৌনে তিন কোটি গ্রামীণ পরিবারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক পরিবার এবং এদের প্রায় ৯২ শতাংশই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষি। এরা চাষ করে অর্ধেকেরও বেশি আবাদযোগ্য জমি। এর সোজা অর্থ, বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন যা হয় তার অর্ধেকের বেশি উৎপাদিত হয় ক্ষুদ্র কৃষকের জমিতে যাদের একর প্রতি ফলন বেশি এটা বিবেচনায় নেওয়া যায়। এই অবস্থায় শ্রমিকের অভাব ও উচ্চ মজুরি, সেচ, সার, বীজসহ সকল উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং পুঁজির স্বল্পতা হেতু নগদ উৎপাদন খরচ যেভাবে বাড়ছে তা মেটানো ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ছে। সরকারের পক্ষে ভর্তুকি দিয়ে দীর্ঘদিন এ অবস্থা টিকিয়ে রাখাও দুরূহ ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে ক্ষুদ্র কৃষকদের কী হবে? তারা টিকে থাকতে পারবে কিনা? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর যতটা না অর্থনৈতিক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক অর্থনীতি। আমাদের মাঠ পর্যায়ের তথ্য ইঙ্গিত করে যে বর্তমান বাজার দামে প্রধান খাদ্য শস্য ধান চাষ লাভজনক নয় এবং যাদের নিজেরা শ্রম দিতে পারে কেবল তারা কোনো রকমে নিজের খোরপোশ চাহিদাটা মেটানোর তাগিদে ধান চাষ করে থাকে। তাও আবার তাদের সন্তানসন্ততি কৃষি থেকে সরে যাওয়ায় শ্রমিকের যে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে তার শিকার এখন অপেক্ষাকৃত এসব দরিদ্র চাষিরাও। পরিবার প্রধান হিসেবে কৃষি এখন বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের ওপরও বর্তেছে। বিশেষ করে যেসব পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাইরে থাকেন, সেখানে মহিলাদেরকে এগিয়ে আসতে হচ্ছে ক্ষেত খামারের কাজে সহায়তা করতে। আগেই বলেছি, উৎপাদন প্রযুক্তি হাতের কাছে পাওয়া যাওয়ায় এটা সম্ভব হচ্ছে।

এই অবস্থায় টেকসই স্মার্ট কৃষি নিয়ে এগিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে প্রচলিত পারিবারিক কৃষির ধারণা থেকে অর্থনৈতিকভাবে আরও লাভজনক হতে পারে এমন কৃষি ব্যবস্থার দিকে যেতে হবে। অর্থাৎ খামার উৎপাদন, পণ্য প্রক্রিজাতকরণ ও বিপণনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে ভাবতে হবে। এখানে আরও বিশদ তর্ক-বিতর্কের স্বার্থে মাঠ পর্যায় থেকে লব্ধ ধারণার ভিত্তিতে কিছু ভাবনা তুলে ধরা হলো। প্রথমত, কৃষি উৎপাদনকে খামার পর্যায়ে টেকসইভাবে লাভজনক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি পণ্যের বাজার দর উচ্চ পর্যায়ে নিশ্চিত করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে উৎপাদন খরচের হিসেবে জাত ও ফলন ভেদে ধানের বাজার দর মন প্রতি ১,৪০০-১,৫০০ টাকার নিচে নামলে ধান চাষে কেউ বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী হবে না। তাহলে তারা অন্য ফসল যেমন ভুট্টা, সরিষা, তিল, রবি শস্য- এসবে চলে যাবে এবং এটা শুরু হয়ে গেছে বলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এটাতে আপাত কৃষকের কিছু আর্থিক লাভ হলেও পরিণামে চাল উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বর্ধিত পরিমাণে চাল আমদানির ওপর নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এটা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যে কাম্য নয় তা ভাবনার বিষয়।

দ্বিতীয়ত, আগেই আলোচিত নব-সঞ্চালিত মালিক-চুক্তিদার মডেলের আদলে কৃষি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক লক্ষ্য পূরণের জন্য বহু কৃষকের বিক্ষিপ্ত জমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে পরিচালনগত

একত্রীকরণের মাধ্যমে কার্যত খামারের আয়তন বাড়িয়ে নেওয়ার কৌশল উদ্ভাবন করা প্রয়োজন এবং এ ধরনের কৌশলের প্রতি রাষ্ট্রের নীতি সমর্থন দেওয়ার কথা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা দরকার।[১৬]

তৃতীয়ত, অনেকেই কৃষি সমবায়ের কথা বলে থাকেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকেই গ্রাম সমবায়ের ওপর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি অনুষদের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের শিমলা ও কাতলসার গ্রামে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের নেতৃত্বে এবং গণমিলন সংস্থার উদ্যোগে যৌথ খামার ব্যবস্থার ওপর পাইলট প্রকল্প হিসেবে গবেষণা হাতে নেওয়া হয়। পরে আমরা এ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো সুখকর অভিজ্ঞতা পায়নি। গ্রাম সমবায় ও কুমিল্লা কৃষি সমবায় মডেল (কেএসএস) এর অকার্যকারিতা ও গ্রামীণ প্রভাবশালী 'কুলাকগণ' সমবায়ের দখল নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে (ডুমন্ট, ১৯৭৩; খান ১৯৭৯; চৌধুরী, ১৯৭৫)। আমাদের মতে, সমবায় বা যৌথ খামারের ধারণাকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে না দেখে বিদ্যমান বাজার অর্থনৈতিক আবহে বাণিজ্যিক কৃষির প্রতিযোগিতামূলক দক্ষ উৎপাদন ও বিপণনমুখী সংগঠন হিসেবে দেখা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। দেশের বহু শিক্ষিত তরুণ উদ্যোক্তা ইতোমধ্যে কৃষক হাব, বিপণন ক্লাব, অনলাইন উপকরণ সরবরাহ, স্মার্ট যন্ত্র সেবাদান ইত্যাদি পার্টনারশিপ ব্যবসা শুরু করেছে। এগুলোতে ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের স্বল্প উৎপাদিত পণ্য একত্রে সমাহার করে বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথে দরকষাকষির সুযোগ ও শক্তি অর্জন করছে। সিনজেন্টা ফাউন্ডেশনের এমন পরীক্ষাধীন উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কার্যকর মনে হয়েছে।

চতুর্থত, জমির প্রতি মানুষের তীব্র আগ্রহ ও আবেগ খুব সহজে দূর হওয়ার নয়। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যখন সরকারি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে লাভজনক বিনিয়োগে আস্থার সংকট থাকে, তখন যার যা জমি আছে তাই আঁকড়ে থাকার প্রবণতা থাকাই স্বাভাবিক। সেই কারণে বাংলাদেশে পশ্চিমা ধাঁচে বৃহদাকার কর্পোরেট খামার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেশ সীমিত। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে বিকল্প হাইব্রিড ব্যবস্থা হিসেবে বড় বড় এগ্রো-বিজনেস কোম্পানিগুলো মানসম্পন্ন উপকরণ, যন্ত্র সেবা, প্রশিক্ষণ, গ্রিন হাউজ ও পণ্য বিপণন সুবিধার সম্প্রসারণ ইত্যাদি উদ্যোগে কৃষকদেরকে সম্পৃক্ত করে নৈতিক মানসম্পন্ন কৃষি ব্যবসা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এর ফলে কর্পোরেটগুলো নতুন নতুন চৌকস কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সূচনা করে একর প্রতি উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে পারে। তাতে উৎপাদক ভোক্তা উভয়েরই লাভ হবে। অপরদিকে ক্ষুদ্র কৃষকরা কর্পোরেটগুলোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কৃষক (কন্ট্রাক্ট নোডাল ফার্মার) হিসেবে সংযুক্ত থাকতে পারে। বেশ কিছু বীজ ও সুগন্ধী চাল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এভাবে ছোট বড় কৃষকদেরকে প্রযুক্তি ও পণ্য বিপণন ব্যবসার সাথে ইতোমধ্যেই জড়িয়ে রেখেছে বলে জানা গেছে। তবে কৃষকদের মাঝে কারা এ ব্যবস্থায় চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে বা কে কতটুকু লাভবান হচ্ছে তার জন্য মাঠ পর্যায়ে গবেষণার দরকার।

[১৬] কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে প্রতিটি জেলায় প্রদর্শনের জন্য একটি করে 'সমলয় খামার' (সিনক্রোনাইজড ফার্মিং) চালু করেছে। এর মাধ্যমে মোটামুটি ৫০ একর জমির একটি ব্লকের কৃষকদেরকে সংগঠিত করে একসঙ্গে যন্ত্র দিয়ে চাষ, রোপন, ফসল কর্তন ইত্যাদি কাজ একত্রে করে বৃহদাকার খামারের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সুবিধাদি দেখানো হচ্ছে, যদিও এর কোন গবেষণা মূল্যায়ন এখনও করা হয়নি।

পঞ্চমত, এগ্রো-বিজনেস কোম্পানিগুলো কৃষিতে পশ্চাৎসংযোগ (ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ) সৃষ্টিতে যতটা সফলতা দেখিয়েছে, সম্মুখ সংযোগ (ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ) সৃষ্টিতে ততটা এখনও এগিয়ে আসতে পারেনি। অর্থাৎ ছোট ছোট নব্য কৃষকরা ধানের পাশাপাশি ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে যে ভুট্টা, আলু, পাট, তৈলবীজ আবাদ করছে সেগুলোর প্রক্রিয়াজাত শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে ক্ষুদ্র কৃষকদের লাভ বাড়বে। প্রসঙ্গত বলা যায়, আমাদের খাদ্যশিল্প এখনও আমদানি নির্ভর শিশু অবস্থা থেকে পরিপক্কতার পথে এগুচ্ছে না। আমরা মনে করি, আগামী দিনের কৃষি কতটা লাভজনক হবে বা ক্ষুদ্র কৃষকরা কীভাবে টিকে থাকবে তা বহুলাংশে নির্ভর করবে দেশীয় খাদ্যশিল্পের বিকাশের ওপর।

ষষ্ঠত, হ্যাজেল ও অন্যরা (২০১০) এবং হ্যাজেল (২০১৩) বিশ্ব পরিসরে ক্ষুদ্র খামারিদের উন্নয়নের জন্য তিনটি কৌশলের পরামর্শ রেখেছেন। প্রথমত, বাণিজ্যিক লক্ষ্যে পরিচালিত খামারগুলোকে ব্যবসায়িক সমর্থন দেওয়া। বাংলাদেশের অবস্থায় আমরা কেবল বৃহৎ কর্পোরেটগুলোকে নয় তার সাথে বাণিজ্যকায়িত নব্য ক্ষুদ্র খামারগুলোকেও ব্যবসা সমর্থনের আওতায় আনার প্রয়োজন অনুভব করি। দ্বিতীয়ত, খোরপোশ কৃষকদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। বিশেষ করে এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যাদের কিছু কৃষি জমি আছে কিন্তু জনবল নেই বা অন্য কোনো আয়ের উৎস নেই, তাদের টিকে থাকাটা বেশ কষ্টকর। আমরা তাদেরকে ব্যাংক ঋণ সহায়তা দিয়ে স্বল্প জমিতেও উৎপাদিতা বৃদ্ধির কৌশল নিতে পারি। এমনকি যারা জমি বর্গা বা লিজ নিয়ে লাভজনক কৃষি পণ্যের আবাদ করতে চায়, তাদেরকেও লিজ মূল্য বাবদ ব্যাংক থেকে নগদ পুঁজির সংস্থান করা যায়।[১৭] তৃতীয়ত, যারা কৃষি থেকে বিদায়ের ক্রান্তিকালে রয়েছে তাদেরকে অন্য পেশায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য গ্রামীণ অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া। এ ব্যাপারে আমাদের মত হচ্ছে, আধুনিক কৃষি মানেই হচ্ছে ব্যবসায়িক কৃষি। এতে অন্যান্য ব্যবসার মতোই অনেকেই টিকে থাকতে পারবে না। বাংলাদেশেও তাই ঘটছে। যাদের কৃষিতে পোষাচ্ছেনা তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে অকৃষি খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। আমাদের গবেষণায় দেখেছি, গ্রামীণ হাট-বাজার ও গ্রোথ পোলগুলোতে ছোট বড় কৃষক পরিবারের সদস্যগণ নানা ধরনের অকৃষিকাজে নিয়োজিত হচ্ছে এবং কৃষিকাজ ছেড়ে এসেছে বলে তাদের পরিবারের কোনো অনুতাপ বা আক্ষেপ নেই। তাদের আয়ের একটা অংশ আবার কৃষিতেই ফিরে আসছে চাষবাস বা জমি লিজ নেওয়ার উদ্দেশ্যে। অবশ্য এর সঙ্গে রেমিট্যান্স আয়ও যুক্ত হচ্ছে। এটাকে আমরা অন্তঃপারিবারিক ভর্তুকি (ক্রস সাবসিডাইজেশন) হিসেবে অভিহিত করেছি। পারিবারিক কৃষি টিকে থাকা বা পুরোপুরি বাণিজ্যিকায়িত খামারে পরিবর্তনে বিলম্বের এটা একটা অন্যতম প্রধান কারণ।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র চাষীদের অনেকেই হয়তো টিকে থাকবে না, আবার অনেকেই থাকবে অথবা অকৃষি খাতের আয় দিয়ে ক্ষুদ্র পারিবারিক খামারকে টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তার ফলে একদিকে সর্বাঙ্গীন বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে এবং অন্যদিকে কৃষিতে আগের চেয়ে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে কৃষি সম্পদ ব্যবহারে অবদক্ষতা (সাব-অপ্টিমাল ফ্যাশন) আরও প্রলম্বিত হবে। কী গতিতে কী মাত্রায় এটা ঘটবে তা সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করবে। দেখার ব্যাপার যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা শহুরে মানুষের স্বার্থ বিবেচনায় খাদ্য সামগ্রীর দাম নিম্ন পর্যায়ে রাখার পক্ষে নীতি-কৌশল অনুসরণ করে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচের বিপরীতে কীভাবে গ্রামীণ কৃষি খামারিদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দামের নিশ্চয়তা বিধান করে।

[১৭] বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্গাচাষী ঋণ প্রথা এই ব্যবস্থারই অনুরূপ কার্যক্রম ছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

আদনান, স্বপন (২০২২)। *গ্রাম বাংলার রূপান্তর*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (২০২০)। *কৃষি ডায়েরি ২০২০*। খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২৩)। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩*। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বারকাত, আবুল ও অন্যান্যরা (২০২২)। *ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা।

মন্ডল, এম. এ. সাত্তার (২০১৯)। *উন্নয়নের গল্প: কৃষি খাদ্য গ্রামোন্নয়ন*। গ্রন্থ কুটির, বাংলাবাজার, ঢাকা।

দেবনাথ, নারায়ণ চন্দ্র (২০১৯)। *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা*। দেরাজ প্রিন্টার্স, ঢাকা।

BBS. (2019). *Preliminary report on agriculture census, 2019.* Dhaka.

BBS. (2018). *Report on agriculture and rural statistics 2018.* Dhaka.

BBS. (1979). *Statistical pocket book of Bangladesh.* Dhaka.

Billah, S. M. M. (2021). *The politics of land law*. Dhaka: University Press Limited.

Chowdhury, M. K. (1975). *First Five Year Plan, Economic Development, of Policy Instruments and Institutions in Bangladesh* (No. 241). Center Discussion Paper No. 241, Yale Univesity. Economic Growth Center, New Haven, CT.

Dumont, R. (1973). Problems and prospects for rural development in Bangladesh. *Dhaka: Working paper submitted to the Ford Foundation, Dhaka, 30 November.*

Hamid, M. A. (1993). A data base on agriculture and foodgrains in Bangladesh (1947-48 to 1989-90). *Published by* Ayesha Akhter, Dhaka.

Hazell, P., Poulton, C., Wiggins, S., & Dorward, A. (2010). The future of small farms: Trajectories and policy priorities. *World Development*, *38*(10), 1349-1361.

Hazell, P. (2013). *Is small farm led development still a relevant strategy for Africa and Asia? New directions in the fight against hunger and malnutrition.* New York: Cornell University. Available at: http://ppafest. nutrition. cornell.edu/authors/hazell-final.pdf.

Hossain, M. (1974). Farm size and productivity in Bangladesh agriculture: A case study of Phulpur farms. *The Bangladesh Economic Review*, *2*(1), 469-500.

Hossain, M., & Bayes, A. (2015). Leading issues in rural development: Bangladesh perspective. New Market, Dhaka: A. H. Development Publishing House.

Jabbar, M. A., Mandal, M. A. S., & Elahi, K. K. (1980). Usufructuary land mortgage: A process contributing to growing landlessness in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Agricultural Economics*, *3*(454-2016-36553), 1-20.

Khalil, M. I. (1991). *The agricultural sector in Bangladesh: A database.* USAID/Bangladesh.

Khan, A. R. (1978). The *Comilla model and the integrated rural development programme of Bangladesh: An experiment in co-operative capitalism*. *World Development, 7 (4&5),* 397-422.

Mandal, M. A. S. (1980a). Farm size, tenure and productivity in an area of Bangladesh. *Bangladesh Journal of Agricultural Economics*, *3*(1), 21-42.

Mandal, M. A. S. (1980b). Seasonality of farm labour use in an area of Mymensingh District. *Bangladesh Journal of Agricultural Economics*, *3*(1), 71-76.

Mandal, M. A. S. (1987). Imperfect institutional innovation for irrigation management in Bangladesh. *Irrigation and Drainage System*, *1*(3), 239-358

Mandal, M. A. S., Biggs, S., & Justice, S. E. (2017). Bangladesh: A special case of rural mechanization and rural development. In M. A. S. Mandal, Stephen D. Biggs & Scott E. Justice (Eds.), *Rural mechanization: A driver in agricultural change and rural development.* Dhaka: Institute for Inclusive Development and Microfinance (InM).

Mandal, M. A. S. (2000). Dynamics of irrigation water market in Bangladesh. In: *Changing rural economy of Bangladesh.* Bangladesh Economic Association, 118-128.

Ministry of Finance (2023). *Bangladesh economic review, 2023*. Government of the People's Republic of Bangladesh.

Morshed, A. Z. (2022, August 7). Understanding rural transformation 2.0 in Bangladesh. *The Daily Star*.

Myrdal, G. (1968). *Asian Drama: An inquiry into the poverty of nations*. London, UK: The Penguin Press.

Palmer-Jones, R. (2001). Irrigation service markets in Bangladesh: Private provision of local public goods and community regulation. In: S*ymposium on managing common resources: What is the solution*, 10-11.

Planning Commission (1973). *The first five-year plan, 1973-78*. Government of the People's Republic of Bangladesh, November.

Rahman, A. (1986). *Peasants and Classes*. London: Zed Books Limited.

Rahman, M. S. (2014). *The pattern of agrarian structure in rural Bangladesh: An ethnographic study of a village in Rajshahi district* (Doctoral dissertation, University of Rajshahi). Published by Samarendra Nath Goswami. Dhaka. ISBN: 978- 984-33-6262-9.

Sen, A. K. (1962). An aspect of Indian agriculture. *Economic Weekly*, *14*(4-6), 243-246.

Sen, B. (2018). *The rise of landless tenancy in rural Bangladesh: Analysis of the recent evidence.* Presentation made at the BIDS Research Almanac. Dhaka, 1-27.

Sen, B., Khanam, T.S., Munshi, S.K., Rahman, S.M., Murshed, M. (2023, December). *Choice of tenancy in rural Bangladesh: Evidence from the 62-village, HIES, and BIDS-BARD 6-village surveys*. Presentation made at the BIDS ABCD, Dhaka.

Wood, G. D., & Palmer Jones, R. (1991). *The water sellers: A cooperative venture by the rural poor*. USA: Kumarian Press.

Wood, G., & Mandal, M. A. S. (2022). Rentiers and contractors: The future of agrarian Bangladesh, Part 2: The disappearance of the Bangladeshi farm? *Review of Agrarian Studies*, *12*(2), 98-129.

Wood, G.D. (2022). Rentiers and contractors: The future of agrarian Bangladesh Part 1: The agrarian transition since liberation. *Review of Agrarian Studies*, *12*(1), 9-30.

World Bank (2016). *Dynamics of rural growth in Bangladesh*. Conference edition, May 17.

Wood, G. (2022). Rentiers and Contractors: The Future of Agrarian Bangladesh Part 1: The Agrarian Transition Since Liberation. *Review of Agrarian Studies*, *12*(1), 9-30.